kw³kvjx Iq¨vi‡jm, A¯¿ nv‡Z PÆMÖv‡gi cvnv‡o ARNO©i GKRb Kgv‡Ûvi, gv`vmvi QvÎ‡`i †Unbs w`‡q GivB ˆZwi K‡i Rw½ mš¿vmx| hviv Qwo‡q c‡o mviv †`‡k

PÆMÖv‡gi KIgx gv`vmv

Rw½ mš¿vmx ˆZwii KviLvbv

সাপ্তাহিক ২০০০ রিপোর্ট

চট্টগ্রামের লালখান বাজার এলাকার দারুল উলুম মাদ্রাসা, হাটহাজারীর দারুল উলুম মইনুল মাদ্রাসা এবং পটিয়ার আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া (আল জামেয়া আল ইসলামিয়ার এই তিন কওমি মাদ্রাসার অধীনে দেশজুড়ে পরিচালিত হচ্ছে প্রায় প্রায় ৭ হাজার কওমি মাদ্রাসা।

এই তিন কওমি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির মূল সূতিকাগার। গোয়েন্দা সূত্র মতে জঙ্গি সংগঠন 'হরকাতুল জেহাদ' এই তিন মাদ্রাসা থেকে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের জঙ্গি তৎপরতা। জন্ম দিচ্ছে শত শত ধর্মান্ধ উগ্র জঙ্গির। যারা নিঃশঙ্কচিত্তে হত্যা করতে উদ্যত হয় কবি শামসুর রাহমান অথবা বাংলা ভাষার গবেষক, বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ভাষাবিদ ড. হুমায়ুন আজাদের মতো বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। একের পর এক বোমা হামলায় যারা প্রথম সারির নাগরিকদের উড়িয়ে দেবে। অন্ধকার ধোঁয়ার জগতে নিমজ্জিত করে দেবে গোটা দেশ। ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের কয়েক নেতার পরিচালনায় চলছে এ কার্যক্রম।

এই তিন মাদ্রাসা কখনো-

* জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে না।

* জাতীয় দিবসগুলোতে ছুটি পালন করে না।

* মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে না।

* উর্দু ও আরবি ছাড়া কোনো ভাষা এদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হয়)।

পরিচালিত হচ্ছে- 'আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ' (বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) যা পটিয়া মাদ্রাসার নিজস্ব। এই বোর্ডের অধীনে।

এদের মূল কাজ

* বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে জঙ্গি আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

* জঙ্গি তৎপরতার অংশ হিসেবে ছাত্রদের নিতে হয় জঙ্গি প্রশিক্ষণ।

* মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং ইসলামী জঙ্গি নেতাদের নির্দেশনা মতো সাত হাজার মাদ্রাসার ছাত্ররা নির্দিষ্ট এলাকা সমূহে বিক্ষোভ ও জ্বালাও পোড়াও সহ জঙ্গি তৎপরতা পরিচালনা করে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবানসহ সীমান্ত এলাকাগুলোতে এদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, বরিশাল, উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী কিছু এলাকাসহ সারা দেশের ৭ হাজার কওমি মাদ্রাসা এ তিন মাদ্রাসার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

২০০২-এর মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখা-১ -এর সিনিয়র সহকারী সচিব এসএম হারুণ অর রশিদ স্বাক্ষরিত এক সার্কুলারে চট্টগ্রামের পটিয়ার আল জামেয়া আল-ইসলামিয়া, হাটহাজারীর দারুল উলুম মইনুল এবং লালখান বাজারের দারুল উলুম মাদ্রাসাসহ কয়েকটি মাদ্রাসার তালেবান নেটওয়ার্কের কথা উল্লেখ করা হয়। এদের বিরুদ্ধে তালেবান সম্পৃক্ততা ও মুজাহিদ বাহিনী গঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের অভিযোগ এনে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।

স্থানীয় প্রশাসন সব জেনেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পালনে বিন্দুমাত্র তৎপরতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই

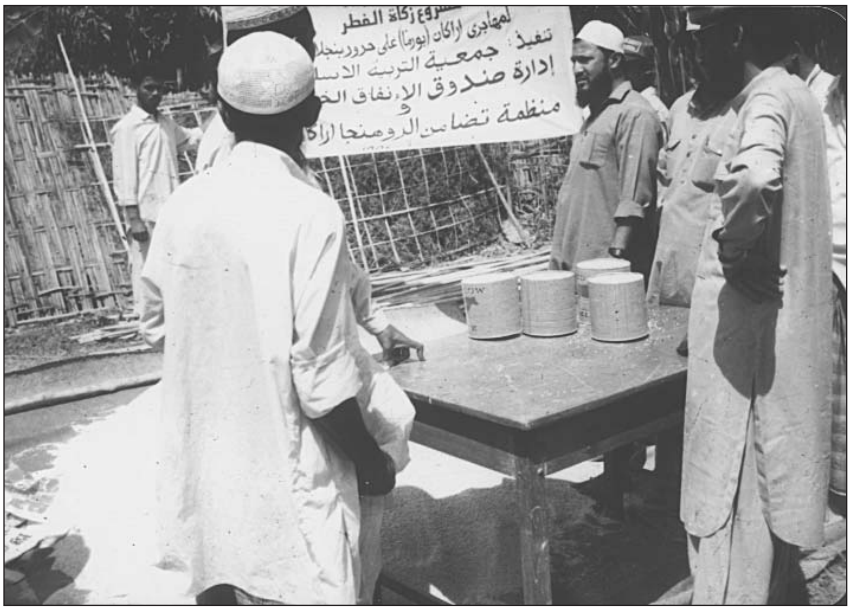

gv`vmv KZc‡¶i D‡`¨v‡M Avbv n‡q‡Q ivmvqwbK c`v_| hv e¨envi n‡e bvkKZvgjK KgKv‡Û| GR‡b¨ cwk¶Y w`‡q AwfÁ K‡i †Zvjv nq gv`vmv Qv Î‡`i

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার নির্বাচিত ছাত্রদের প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। প্রশাসন এসব জানে। জেনেও তারা নির্লিপ্ত। এই কওমি মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তম চট্টগ্রাম হয়ে পড়ছে জঙ্গি সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য

সুযোগে দ্বিগুণ শক্তিতে বিস্তৃত হয়েছে জঙ্গি তৎপরতা

যারা রয়েছেন নেতৃত্বে

ইসলামী ঐক্যজোটের সেক্রেটারি জেনারেল মওলানা মুফতী ইজাহারুল হক, সদস্য মাওলানা বুখারী, মাওলানা ইয়াহিয়া, মাওলানা হারুন, মাওলানা সানাউল ইসলাম, টেকনাফ থানা সভাপতি মাওলানা আফসার উদ্দিন, মাওলানা নূর হোসেনসহ অন্যান্যরা। জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র শিবির পরিচালিত গোপন কার্যক্রম গভীর সম্পর্কযুক্ত এ জঙ্গি তৎপরতায়। এ স্বীকারোক্তি এসেছে ২২ জানুয়ারি ২০০১ চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকা থেকে গ্রেপ্তারকৃত আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের (এ আরএনও) কমান্ডার ইন চিফ সলিমউল্লাহর বক্তব্য থেকে। এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ২৯ জানুয়ারি '০১ সেই সময়কার সহকারী পুলিশ সুপার উখিয়া সার্কেল পুলিশ সুপারের কাছে দাখিল করেন সলিম উল্লাহর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে।

৩০ আগস্ট ২০০০ উখিয়ার গহিন অরণ্যের এক ঘাঁটি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মাদ্রাসা শিক্ষক আবু ইয়াসিনকে। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ২২ জানুয়ারি ২০০১ গ্রেপ্তার হয় এআরএনও কমান্ডার ইন চিফ সলিম উল্লাহ (বর্তমানে চট্টগ্রাম কারাগারে আটক)। সলিমউল্লাহর বক্তব্য অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতায় আরএসও এবং এআরএনও এদেশে কর্মকান্ড চালাচ্ছে। '৭৯ সালে ছাত্র শিবির ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (আইআইএফএস)-এর সদস্যপদ লাভ করে। তৎকালীন সভাপতি ও বর্তমান সাংসদ (কুমিল্লা-১৪) এমএ তাহের এ সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। শিবিরের প্রথম সভাপতি মীর কাশেম আলী রাবেতা আল আলম ইসলামীর পরিচালক। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর কাশেম আলী।

পুলিশের প্রতিবেদনে বলা হয় বার্মার ছাত্র সংগঠক ইকতাদুল তুলাহ আল মুসলিমিন এবং আরএসওর ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের গভীর সম্পর্ক। সৌদি আরব ভিত্তিক ডব্লিউওয়াইএমএ (World association of Muslim youth), রাবেতা আল আলম আল ইসলামী এবং কুয়েতভিত্তিক আইআইএফএসও (International Islamic Federation of Students Organisation) চট্টগ্রামে তৎপরতা জামায়াতের মাধ্যমে পরিচালিত। ১৯৯২ সালে হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় জঙ্গিগোষ্ঠীর। যা এখনো সক্রিয়।

এই দাতা সংস্থাসমূহ জামায়াতের সুপারিশ ছাড়া কোনো সংগঠনকে সাহায্য সহযোগিতা করে না।

পুলিশের তালিকায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চট্টগ্রাম অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তারা স্বীকার করেন জঙ্গি প্রশিক্ষণের বিষয়। সে সঙ্গে নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করে বলেন, এসব দুর্গম এলাকায় জঙ্গি প্রতিরোধে যেতে হলে সেনা-বিডিআর-এর অনুমতি এবং সহযোগিতা দুটোই জরুরি। পুলিশের তথ্য মতে গত ১৪-১৬ মে '০৪ নাইক্ষ্যংছড়ির গহিন পাহাড়ে রোহিঙ্গা ন্যাশনাল কনভেনশন (RNC) হয়। এতে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার নির্বাচিত ছাত্রদের প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। প্রশাসন এসব জানে। জেনেও তারা নির্লিপ্ত। এই কওমি মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তম চট্টগ্রাম হয়ে পড়ছে জঙ্গি সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য। চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়ছে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড।

সারা দেশের জঙ্গি আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে পটিয়ার আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসা।

পটিয়া থানা থেকে ৫০০ গজ উত্তর-পূর্বে ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। মূল কমপ্লেক্স-১৪ একর জায়গা নিয়ে (অধিকাংশই অস্ত্রের জোরে জঙ্গি হামলার মাধ্যমে দখলের অভিযোগ আছে)।

ছাত্র সংখ্যা- ৪ হাজার

শিক্ষক- ১০০

পাঠদানের ভাষা- আরবি ও উর্দু মূল ভাষা (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা)

বার্ষিক আয় (২০০৩ সালে) - ২৮ কোটি

৮৪ লাখ ৭ হাজার ৯৯৭ টাকা

বার্ষিক ব্যয় (২০০৩ সালে)- ২৮ কোটি ৭৬ লাখ ৭ হাজার ৬২৪ টাকা

(মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের রেকর্ড মতে)।

নিয়মিত প্রশিক্ষণ: অস্ত্র, তলোয়ার, কুংফু, কারাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জিহাদী কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করা, কালো কমব্যাট পোশাকের জঙ্গির অবস্থান রয়েছে এ মাদ্রাসায়।

দাতা: সৌদি আরব, লিবিয়া, আরব আমিরাত, মিসরসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের ইসলামী এনজিওসমূহের অনুদানে এ মাদ্রাসার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আন্তর্জাতিক ইসলামী জঙ্গি নেতা হিসেবে পরিচিত এ রকম অনেকেই নিয়মিত সফরে আসেন। এদের মধ্যে রয়েছে-

১. পাকিস্তানের মুজাহিদ-ই তাহ্‌ফুজে খত্‌মে নবুয়্যত নেতা

মওলানা মনজুর আহমেদ চিউনিটি

২. পাকিস্তানের জমিয়তুল উলমুল ইসলামিয়া নেতা মাওলানা ইউসুফ বিন নূরী

৩. ভারতের মুফতি আনজার শাহ কাশ্মিরী

৪. ভারতের মুফতি তাহয়্যেবুল ইসলাম কাশ্মিরী

৫. ওসামা বিন লাদেনের সমর্থক মিয়ানমারের নাগরিক ড. নুরুল ইসলাম। রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন ও আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্টের সমন্বয়ে গঠিত ARNO-এর চেয়ারম্যান এবং বিশ্ব মুসলিম সংস্থার তিনি উপদেষ্টা।

ইসলামী ঐক্যজোটের নেতৃত্বাধীন সাত হাজার মাদ্রাসা থেকে ছাত্রদের বাছাই করা হয়। এই জঙ্গি নেতাদের সংগঠন তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। এই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে কাদের প্রশিক্ষণ হবে, কোথায় প্রশিক্ষণ হবে।

চট্টগ্রামের রাউজান, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি, মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় চলে প্রশিক্ষণ। দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ দেয়। এদের কাছে সব ধরনের আধুনিক অস্ত্র এবং যোগাযোগের ওয়ারলেস সিস্টেম আছে। বাংলাদেশের পোশাকী বাহিনীর সহযোগিতা তারা পায়।

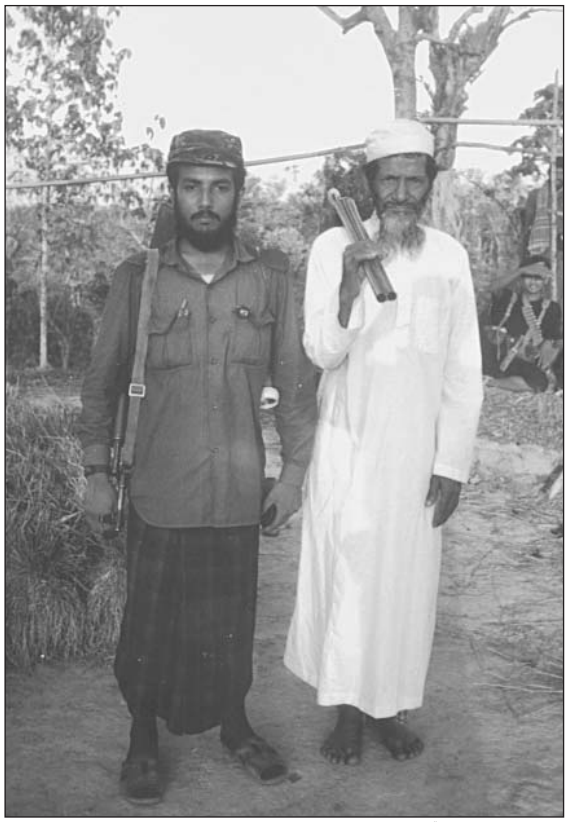

Wwej e¨‡ii e›`K I PvqwbK ivB‡dj nv‡Z `ÔRb| Giv I cwk¶Y wb‡q‡Qb

মামুনসহ অন্যরা হাসানের রুমে গেলেই হাসান আমাকে বের করে দিয়ে বলতো 'নামাজে যাও...' বা এমন কিছু, যাতে রুমে না থাকি। ভাবলাম বের হতে পারলেই ভালো। এ রকম একদিন (২৯ মার্চ-০২) আমি হাসানের রুমে ঢুকে বই উল্টাতে গিয়ে বুক শেলফের নিচের তাকে দেখি সুতা দিয়ে প্যাঁচানো কতোগুলো গুলি। আব্বুকে এসব বললে তো বিশ্বাস করবে না, দেখালে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে মাদ্রাসা ছাত্ররা কী করে! এজন্যে কতোগুলো গুলি নিয়ে পলিথিনে ভরে ব্রিফকেসে নিই। ওখানে 'বন্দুক'ও ছিল। তাই ওর রুমে যখন তখন যাওয়া যায় না। আমি গুলির পলিথিন আমার ব্রিফকেসে ভরে 'আনকমন' পথে বেরিয়ে

এবছরের ৪ মে হাটহাজারীর জঙ্গল থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয় মীর আনিসকে। আনিস পড়াশোনা করেছে পটিয়ার জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসায়। সেখানে তাকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

G‡`i cwk¶Y †kl n‡q‡Q| gv`ªvmv Qv‡Î‡`i cvkvcvwk wewfbœ eqmx‡`i I cwk¶Y †`qv nq

গুলিসহ গ্রেপ্তার কিশোর খালিদ

"আমার পড়া মুখস্থ হয় না। হাফেজি পড়তে চাই না। কওমি মাদ্রাসা ভালো লাগে না। তবু বাবা জোর করে ২৫ মার্চ রাতে এনে পটিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করাতে চায়। মাদ্রাসায় সিট ছিল না। যশোরের হাসান জামিল নামে একটা ছেলে বলে, 'আমার সঙ্গে থাকো। সামনের বছর ভর্তি হয়ে যাবে।' হাসানের কাছে অনেক লোক আসতো। বাকী, যাই। মাদ্রাসার গেটে পজিশন থাকবে, দারোয়ান চৌকি পাহারা দেবে। ভোর হলেই পথ চিনে আম্মুর কাছে চলে যাবো ভেবে আমি এশার নামাজ পড়ার সময় বেরিয়ে গাছতলায় বসেছিলাম রাত ৩টা পর্যন্ত। আমি একটাও মিথ্যা বলিনি।... আমি বাসায় যেতে চাই আম্মুর কাছে।"

সাপ্তাহিক ২০০০কে এ কথাগুলো বলেছিল ৩০ মার্চ ২০০২ চট্টগ্রাম এসপি

অফিসে কিশোর খালিদ হাসান। পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় খালিদকে ভর্তি করাতে এনেছিলেন খালিদের বাবা ২৫ মার্চ-০২। মাগুরা জেলার সাতদোহারা পাড়ার শাহজাহান ভূঁইয়ার কিশোর পুত্র খালিদ কোমরে দড়ি, হাতকড়া নিয়ে করুণ স্বরে এ কথাগুলো বলেছিলো। ৩০ মার্চ '০২ ভোরে সন্দেহভাজন আচরণের কারণে পটিয়া থানা পুলিশ ৬২টি ৭.৬২ বোর গুলিসহ খালিদকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের মতে এ গুলি একে-৪৭ রাইফেলসহ বেশ কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। খালিদ পটিয়া মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের কথাও স্বীকার করেছে। তার ভাষ্যমতে, তাকে মাদ্রাসায় আশ্রয় দেয়া অপর ছাত্র হাসান জামিলের বয়স পঁচিশ ত্রিশ বছর হবে। অর্থাৎ সিনিয়র ছাত্র হলেও তার কতো বড় সেই ধারণাও কিশোর খালিদের নেই। খালিদকে মুক্ত করার কেউ নেই। যারা তাকে সুশিক্ষিত করবে কোথায় আজ তারা? জন্মদাতা পিতার ভুল নির্দেশনা আজ খালিদের এ পরিণতির জন্য দায়ী। কিন্তু সরল ধর্মবিশ্বাসকে যারা পুঁজি করেছে তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশাসনের নির্লিপ্ততা এমন নিষ্পাপ কৈশোরকে ঠেলে দিয়েছে কারাগারের অন্ধকারে। সুন্দর ভবিষ্যৎ হতো যে কিশোরের সেই খালিদের সামনে আজ কেবলই শূন্যতা।

Imvgv web jv‡`‡bi mg_K wgqvbgv‡ii bvMwiK W±i bi"j Bmjvg| †iwn½v mwjWvwiwU AMvbvB‡Rkb I\_AvivKvb †iwn½v BmjvwgK d›U-Gi mgš‡q MwVZ ARNO-Gi †Pqvig¨vb Ges wek gmwjg ms¯vi Dc‡`óv (gv‡S), AvšRwZK mšvmx P‡µi Ab¨Zg †bZv, PÆMv‡gi gv`vmv Qv◊‡`i cwk¶‡Yi gj D‡`¨v³v

চট্টগ্রামের রাউজান, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি, মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় চলে প্রশিক্ষণ। দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ দেয়। এদের কাছে সব ধরনের আধুনিক অস্ত্র এবং যোগাযোগের ওয়ারলেস সিস্টেম আছে। বাংলাদেশের পোশাকী বাহিনীর সহযোগিতা তারা পায়

এবছরের ৪ মে হাটহাজারীর জঙ্গল থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয় মীর আনিসকে। আনিস পড়াশোনা করেছে পটিয়ার জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসায়। সেখানে তাকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারপর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে আনিসসহ আরো কয়েকজনকে নির্বাচিত করে। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় হাটহাজারীর দারুল উলুম মইনুল মাদ্রাসায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কওমি মাদ্রাসার আরো অনেক ছাত্রকে এখানে এনে রাখা হয়। এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় পাহাড়ে। মিয়ানমারের প্রশিক্ষকরা তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে গ্রেপ্তার হয় মীর আনিস। তার কাছে তখন পাওয়া যায় কাঠের তৈরি একে-৪৭ রাইফেল। প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের কাঠের তৈরি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারপর আসল অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হয়। গ্রেনেড ছোঁড়া, বোমা বিস্ফোরণ... সব বিষয়েই তাদের দক্ষ করে তোলা হয়।

গ্রেপ্তার হয়ে এসব কথা স্বীকার করে মীর আনিস।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে পটিয়া মাদ্রাসা জমি দখল শুরু করে। এই দখল নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের বারবার বিরোধ সৃষ্টি হয়। জমি দখলকে কেন্দ্র করে রক্তপাতের ঘটনাও ঘটে।

২০০২ সালে মাদ্রাসার তৎকালীন রেক্টর হারুণ ইসলামাবাদীর সঙ্গে কথা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর। মাদ্রাসার ভেতরে তার রুমে বসে কথা হয়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। যদিও অস্বীকার করেন সশস্ত্র প্রশিক্ষণের বিষয়টি। মাদ্রাসার ভেতরে কেমন যেন একটা লুকোচুরির ভাব লক্ষ্য করা যায়। বেশ কিছু দিকে যেতে দেয়া হয় না। বোঝা যায় এসব দিকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। জানা যায়, এসব এলাকায় চলে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। জমি দখলকে কেন্দ্র করে ২০০২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির সংঘর্ষে মাদ্রাসার ভেতর থেকে গুলি করা হয় গ্রামবাসীদের। গুলিতে নিহত হয় নিরীহ কৃষক ফরিদ। প্রশাসনের সহায়তায় ঘুরিয়ে দেয়া হয় মামলার গতিপথ। কৃষকের গুলিতে কৃষক মারা গেছে- মামলা সাজানো হয় এভাবে।

'৬৬ সালে জমি দখল বিরোধে নিহত হয় ৫ গ্রামবাসী ও ২ পুলিশ। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ মাদ্রাসার পাশের ৭ শতাংশ জমির দখল নিয়ে বিরোধে ১ জন নিহত হয় মাদ্রাসা ক্যাডারদের হাতে।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলুম মইনুল মাদ্রাসা

গত ২ জুন এ মাদ্রাসার পাশে পাহাড় থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয় দুই জঙ্গি। এদের নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ রহস্যময় ভূমিকা পালন করেছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদকের সামনে হাটহাজারী থানায় সহকারী পুলিশ সুপার হাসিব আজিজ নির্দেশ দেন, কোনো সাংবাদিক যেন এ জঙ্গিদের ছবি নিতে না পারে। কোনো কথা বলতে না পারে। এরপরও পত্রিকায় ছবি এবং সংবাদ এসেছে। কর্মচ্যুত হয়েছেন থানার তিন দারোগা। হাসিব আজিজ এই প্রতিবেদককে বললেন, 'আপনারা এসব তথ্য পাচ্ছেন কী করে?'

এই মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ চলে নিয়মিত। অনেকটা প্রশাসনের সহায়তায়। পুলিশ সুপার হাসিব আজিজের বক্তব্য থেকেও সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ক্ষমতার কানেক-শনেও পুলিশ অনেক সময় অনেক জঙ্গি সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে না। বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরের চাচাতো ভাই মীর কাশিম। হাটহাজারীর নারিয়া মাদ্রাসায় তার কর্মকান্ড। অস্ত্রসহ ধরেও পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়।

লালখান বাজার দারুল উলুম মাদ্রাসা

দামপাড়া পুলিশ লাইন মাঠের সঙ্গে লাগানো পাহাড়ি এলাকায় এ মাদ্রাসা।

পরিচালক মুফতি ইজাহারুল হক। দামপাড়া পুলিশ লাইন মাঠে ২০০৩ সালের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের অনুশীলন করছিলো চট্টগ্রামের প্রাচীনতম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল লিটল জুয়েলসের ছাত্র-ছাত্রীরা। ফতোয়া দেয়া হয়- 'বেলেল্লাপনা এখানে চলবে না।' মাদ্রাসার গন্ডি পেরিয়ে পুলিশ লাইন মাঠেও এ মাদ্রাসার কর্তৃত্ব! পুলিশ রাষ্ট্রীয় আইন পালনকারী সংস্থা হয়েও এ মাদ্রাসার নিয়মিত জঙ্গি প্রশিক্ষণে কখনো আইন পালন করতে পারেনি। অব্যাহত রয়েছে তাই এদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ তৎপরতা।

গত ২ জুলাই '০৪ ভোর ৫টায় চট্টগ্রাম বিমান বন্দর থেকে গ্রেপ্তার হয় দুই বর্মী নাগরিক জন লুইন উইদারলি (৩৮) এবং মে শুন (৫২)। লুইন উইদারলির মার্কিন নাগরিকত্ব আছে। আরাকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহকারী পরিচালক। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সিইউএফএল জেটিতে আটক ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার মামলায় যুক্ত এবং রোহিঙ্গা বিদ্রোহী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এ দেশে জঙ্গি তৎপরতায় সম্পৃক্ততা। মে শুনের আরেক নাম খিন মন। নূপা (আরাকান রোহিঙ্গা সংগঠন) সভাপতি খিন মনকে ১৮ জুলাই আদালত রিমান্ডের নির্দেশ দেয়। লুইন উইদারলিকে দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়। এদের সঙ্গে রয়েছে দারুল উলুম মাদ্রাসার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

স্থানীয় অধিবাসী এবং প্রশাসনের নাকের ডগায় জঙ্গি তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসন রহস্যজনকভাবে নির্লিপ্ত। প্রশ্ন ওঠে বারবার- পরিস্থিতি কতোটা ভয়াবহ হলে সতর্ক হবে প্রশাসন? মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, সচিবের আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে, জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

জঙ্গি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে উঠছে বিশাল ধর্মান্ধ জঙ্গি দল। পুঁজি নিরীহ জনগণের সাধারণ ধর্ম বিশ্বাস। দুর্গম পার্বত্য এলাকায় একের পর এক মসজিদ নির্মিত হচ্ছে কার স্বার্থে? নির্ধারিত কিছু ব্যক্তির নিয়মিত আসা যাওয়া চলছে। সাধারণের এখানে প্রবেশ নিষেধ।

হরকাতুল জিহাদ : প্রায় দু'দশকের তৎপরতা

পাকিস্তানভিত্তিক আফগানি জিহাদী সমর্থকদের বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠক হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী। ইসলামিক ইনস্টিটিউট জার্নালের প্রধান সম্পাদক ও ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের পরিচালক মাওলানা ওবায়দুর রহমান খান নদভীর আফগানিস্তানে 'আমি আল্লাকে দেখেছি' বইতে রয়েছে এর লিখিত প্রমাণ। ১৯৮৮র ২৬ ফেব্রুয়ারি লেখকের পিতা কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মওলানা আতাউর রহমান খানসহ ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল পাকিস্তানের হরকাতুল জিহাদ নেতাদের আমন্ত্রণে পাকিস্তান যান। বইতে উল্লেখ করা হয় এসময় ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা। এ বইয়ের ১৩তম মুদ্রণের ১৩০ পৃষ্ঠায় ১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশী শহীদ কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকীর নেতৃত্বে উরগুন সেক্টরে সংঘবদ্ধ জিহাদে যোগ দেয় ৩ হাজার মুজাহিদ। এদের সর্বশেষ শহীদ মুহাম্মদ আলী। ১০ জন চিরদিনের জন্যে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। দেশে ফেরার পর ৩০ এপ্রিল' ৯২ জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয় বাংলাদেশী মুজাহিদদের উদ্যোগে। এরা আফগানিস্তানের সোভিয়েট ও কমিউনিস্ট বিরোধী লড়াইয়ে অংশ নেয় বলে জানায়।

২৮ জুন '০৪ পুলিশের বিশেষ শাখার ডিআইজি শামসুল ইসলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেন। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের যুদ্ধে কিছু বাংলাদেশী জঙ্গি মুসলমান অংশ নেন। এদের ২৪ জন সে সময় মারা যান। অনেকে দেশে ফিরে আসেন। এ প্রসঙ্গে কক্সবাজার পুলিশ সুপার সাপ্তাহিক ২০০০কে গত ২৩ আগস্ট বলেন, রোহিঙ্গা বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের তৎপরতার যৌথ প্রশিক্ষণ বা জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। তবে '৯৬তে কক্সবাজারে গ্রেপ্তার হয় ৪১ জন হরকাতুল জেহাদ জঙ্গির মধ্যে একজন বেকসুর খালাস পায়। ৪০ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারকৃত এদের নামে অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরণ দ্রব্য আইনে মামলা হয়। মামলা নং ১০, ১৯ (২) ৯৬ ধারা ৪ (ক)। ধারা ১৯/এ/এফ। রোহিঙ্গা বিদ্রোহী সংগঠন আরএসওর সঙ্গে আন্তর্জাতিক অস্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে এরা অভিযুক্ত হয়। বাংলাদেশে এদের প্রধান শেল্টারদাতা কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্রয় দেয়। আরএসও মাদ্রাসা ছাত্রদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়। এভাবে স্বার্থ আদান-প্রদানের মাধ্যমে চলছে জঙ্গি তৎপরতা।

রাজশাহী কারাগারে ১৮ জন, রংপুর কারাগারে ১০ জন, যশোর জেলা কারাগারে ১২ জন জঙ্গির বর্তমান অবস্থান। এ প্রসঙ্গে এসপি সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমাদ বলেন, 'এখনো বিদেশী সহায়তায় বিভিন্ন মাদ্রাসা, মসজিদ চলছে। আমরা বেশি খতিয়ে দেখিনি। '৯৬য়ের গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গিরা যেহেতু কারাবন্দি, এসব মামলা তেমন ঘাঁটানো হয় না। প্রত্যন্ত এলাকায় তো পুলিশের যাওয়া হয় না। তবু এর মধ্যে অনেকবারই পুলিশের সঙ্গে জঙ্গিদের বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে। সম্মুখযুদ্ধে পুলিশ নিহত হয়েছে। দুর্গম এলাকার এসব মাদ্রাসা সেনাবাহিনী এবং বিডিআর-এর দেখার দায়িত্ব। রাস্তার ২/১ কি. মি. দূরত্বে যেসব মাদ্রাসা সেসবে তল্লাশি করে একটা লাঠিও পাই না আমরা।' তবে এসব নিয়ে বিশেষ শাখার সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন তথ্য চেয়ে জরুরি চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ।

মাদ্রাসার ভেতরে কেমন যেন একটা লুকোচুরির ভাব লক্ষ্য করা যায়। বেশ কিছু দিকে যেতে দেয়া হয় না। বোঝা যায় এসব দিকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। জানা যায়, এসব এলাকায় চলে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ

কেবলই লুকোচুরি : শেষ কোথায়

কবি শামসুর রাহমানের বাড়িতে গিয়ে হত্যা প্রচেষ্টায় ব্যর্থ গ্রেপ্তারকৃত যুবকদের স্বীকারোক্তি মতে তারা চট্টগ্রামের দারুল উলুম মাদ্রাসা ছাত্র। ঘটনার দীর্ঘদিন পরও পুলিশ তৎপর হয়নি এ মাদ্রাসার জঙ্গি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে। পটিয়া মাদ্রাসার ব্যাপারে এএসপি সার্কেল হাফিজ আক্তার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে এমন কোনো অভিযোগ আমরা পাইনি। কোনো তৎপরতা আমরা দেখিনি যাতে এ মাদ্রাসায় সন্দেহভাজন জঙ্গি প্রশিক্ষণ হয়।' ২৫ মার্চ ২০০২ গ্রেপ্তারকৃত কিশোর খালিদের বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি কিছু জানেন না বলে মন্তব্য করেন।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে সমুদ্র উপকূলে অরক্ষিত সীমান্ত, অস্ত্র চোরাচালান, অত্যাধুনিক অস্ত্রের সহজপ্রাপ্যতা একটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। সিইউএফএল জেটিতে উদ্ধারকৃত অত্যাধুনিক ১০ ট্রাক অস্ত্রের মধ্যে ৪ ট্রাক অস্ত্র গোলাবারুদ পুলিশ লাইন মাঠ দামপাড়াতে 'হাওয়া' হয়ে গেছে। চার্জশিটে ত্রুটির কারণে এ তথ্যে রয়েছে ব্যাপক লুকোচুরি। জঙ্গি তৎপরতায় ব্যবহৃত হচ্ছে একে-৪৭, এম-১৬, এম-'৭৯, বিএ-৬৪, বিএ বিএ-৬৩, বিএ-৯৩ (গ্রেনেড লাঞ্চার), এম এ ১-১৪, এম এ ১১-১৪ এবং রকেট লাঞ্চার -৭ এবং ২। এসবের সঙ্গে কারা জড়িত পুলিশ এবং স্থানীয়দের কাছে সবই প্রায় জানা। তবু সঠিক তথ্যে প্রশাসন সহায়ক নয় কেন? এ লুকোচুরির শেষ কোথায়? কেবলই আক্রান্ত হবে নিরীহ জনগণ বারবার?